জঙ্গলমহলের লৌকিক দেবী টুসু ঃ একটি দার্শনিক সমীক্ষা

অরুণ মাহাত

সারাংশ : টুসু জঙ্গলমহলের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী সমাজের একান্তই একটি লৌকিক দেবী। শস্যের দেবী। জঙ্গলমহলের কুমারী মেয়েরাই প্রধানতঃ এই লৌকিক দেবীর পূজা করেন। এই লৌকিক দেবীর পূজার কোন শাস্ত্রীয় বেদ বিধান অনুযায়ী মন্ত্র নেই। টুসু লোকগানেই এই লৌকিক দেবীর পূজার একমাত্র মন্ত্র। যেহেতু কুমারী মেয়েরাই এই দেবীর পূজা প্রধানতঃ করে সেইহেতু এই টুসু দেবীর পূজা প্রজননজনিত উর্বরতা শক্তির আরাধনা বলে মনে করা হয়। ধানের তুষ - তুষলিকে টুসু দেবী কল্পনা করে পূজা করা প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের ফলেই যে সৃষ্টি সম্ভব হয়—এই দর্শনেরও ইঙ্গিত করে। টুসু দেবীর পূজা যেহেতু অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির রাত থেকে শুরু হয়, সারা পৌষ মাস চলে এবং এই মাসের সংক্রান্তির দিন নদীতে টুসু বিসর্জন সহকারে শেষ হয়, সেইহেতু এই টুসু উৎসবকে শস্যের মৃত্যু উৎসবও মনে করা হয়; কিন্তু এই মৃত্যু উৎসবেও জীবনের চিরন্তন আশা আকাঙ্খার গান গাওয়া হয়। কারণ, এইরূপ মৃত্যু উৎসবের প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্য হল এই যে, মৃত্যুতেই ক্ষণিক মানব জীবনের সব শেষ হয়ে যায় না, মৃত্যু জীবনের চরম সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়, দেহের মৃত্যু হলেও আত্মা অমর, কর্মফল অনুযায়ী আত্মা পুনরায় দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে—এইরূপ চিরন্তন নৈতিক দর্শনের এবং এই আত্মা শুধুমাত্র মানুষের দেহেই অবস্থান করে না, জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা, সর্বভূতে বিরাজমান-এইরূপ সর্বপ্রাণবাদী দার্শনিক তত্ত্বেরও ইঙ্গিত করে জঙ্গলমহলের লৌকিক দেবী টুসুর ধর্মীয় উৎসব।

বীজশব্দ: জঙ্গলমহল, লৌকিকদেবী, আর্যপূর্ব, আদিম দেবদেবী, টুসু, কৃষি উৎসব, প্রজনন জনিত উর্বরাশক্তি, সর্বপ্রাণবাদ, কৃতকর্ম, আত্মার অমরত্ব, পুনর্জন্ম, সাধনা, পুরুষার্থ, মোক্ষ।

"পেট জ্বইলছে ভখহে, হামার, রাগে জ্বইলছে গা!
তালকানা রে! তাইরে-নাইঁরে ঝুমর গাহিস্ না
মন পুইড়ছে পহিল পীরিত টুসু ভাসহান গান
লৈতন যৈবনে ছি ছি! ভাথ-কাপড়ের টান"[১]।

ভারতবর্ষের, পশ্চিমবঙ্গের, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার, জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামের লোককবি ভবতোষ শতপথীর কবিতায় কি মর্মান্তিকভাবে উঠে এসেছে শত অভাবের সংসারেও টুসু ভাসানোর গান মানবমনে প্রথম ভালবাসার স্বাদ নিয়ে আসে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠে আসে কে এই টুসু? গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর বাংলার লৌকিক দেবতা গ্রন্থে এই টুসুকে স্বমহিমায় স্থান দিয়েছেন। এবং গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন, "অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন তার সমাপ্তি হয়। দিনের বেলায় এঁর পুজো ও উৎসব আরম্ভ হয়, সারা পৌষ মাস চলে ওই মাসের সংক্রান্তির দিন তার সমাপ্তি হয়। দিনের বেলায় এঁর পূজা হয় না। বহু পল্লীতে বারোয়ারীভাবেও টুসু পূজা হয়। তবে পল্লীর সকল গৃহস্থ ঘরে নিজেরও একটি করে টুসু মূর্তির পূজা হয়।"[২] ডঃ দয়াময় মণ্ডল অবার মনে করেন, টুসুগানে সেকালের মানুষের ধর্মচর্চার পরিচয় তেমনভাবে পাওয়া যায় না।[৩]

অতএব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গবেষকরা বিভিন্ন সময় জঙ্গলমহলের এই লৌকিক দেবী টুসুকে নিয়ে গবেষণাপত্র রচনা করেছেন, এবং বিভিন্ন দিক পাঠক সমাজে তুলে এনেছেন। সমস্ত দিকগুলি এই প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমি শুধুমাত্র জঙ্গলমহলের এই টুসু নামক লৌকিক দেবীর ধর্মচর্চার দার্শনিক ভাবনাগুলিকে নির্মাণ করার চেষ্টা করিব।

টুসু সম্পর্কিত যে দুটি প্রধান লোককথা গবেষকদের গোচরে এসেছে, তার মধ্যে প্রথমটি হল জঙ্গলমহলের কুড়মি

মাহাত সম্প্রদায়ের এক মেয়ের নাম ছিল টুসু। এবং তার প্রেমিক ছিল কুড়মি-মাহাত সম্প্রদায়েরই এক যুবক। একদিন মুসলমান আক্রমণে এই টুসু এবং তার প্রেমিক বন্দি হন এবং ছাড়াও পায়। কিন্তু কুড়মি-মাহাত সম্প্রদায় আর তাদেরকে গ্রহণ করেনি। টুসুর প্রেমিক তখন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়, এবং টুসু বিরহ বেদনায় ঘর থেকে পালিয়ে যায়। এবং একদিন জঙ্গলমহলের সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দুজনের মিলন হয়। কিন্তু টুসু দীর্ঘদিন অনাহারে অনিদ্রায় বিরহক্লিষ্টা হয়ে থাকার ফলে মিলনের সময়েই মারা যায়।[৪] দ্বিতীয় লোককথাটিও জঙ্গলমহলের কুড়মি-মাহাত সম্প্রদায়ভুক্ত। জঙ্গলমহলের এক কুড়মি-মাহাত মেয়ের নাম ছিল টুসু। মুসলমানেরা জঙ্গলমহল আক্রমণ করলে টুসুকে নিয়ে তার পিতা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়, এবং সাঁওতাল সমাজের কাছে আশ্রয় চায়। জঙ্গলমহলের সাঁওতালরা শপথ নিলেন টুসুর ইজ্জত রক্ষার। তীর ধনুক নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই চলল। কিন্তু টুসু বুঝতে পেরেছিলেন ইজ্জত রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই জঙ্গলমহলের সুবর্ণরেখা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে টুসু প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।[৫]

অতঃপর বলা ভাল এই ধরনের লোককথাগুলিকে কিন্তু অনেক গবেষকেই আমল দিতে চাননি। এরা মনে করেন, এই ধরনের লোককথাগুলি আসলে জঙ্গলমহলের লৌকিক দেবী টুসুকে অপমান করার জন্যেই খুব সচেতনভাবে প্রচার করা হয়েছে। টুসু হল জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজের একান্তই এক লৌকিক দেবী।[৬]

দুর্গাপূজা যদি বাঙালির জাতীয় উৎসব হয় তাহলে জঙ্গলমহলের জাতীয় উৎসব হল টুসুপূজা। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে আদিবাসী মানুষের প্রাণের স্বতোৎসারিত আনন্দের প্রকাশ টুসু পরবে যেভাবে প্রকাশিত হয়, অন্যকিছুতে তা হয় না। এবং এই টুসু পরবের গানেই মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙক্ষা প্রকাশিত হয়।[৭] যেমন —

"মাগো হামার মন কেমন করে
যেমন শোল মাছে উফাল মারে।
এত বড় পৌষ পরবে, রইলি মা পরের ঘরে
মাগো হামার মন কেমন করে।"[৮]

পৌষ পরবে অর্থাৎ টুসু পরবের সময় মা মেয়েকে শ্বশুরঘর থেকে নিজের কাছে আনতে না পারার যন্ত্রণা এই টুসু গানে আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে।

এই টুসু গানই এই পরবের একমাত্র মন্ত্র। এবং টুসু উৎসব একান্তভাবেই জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের উৎসব। প্রকৃতপক্ষে টুসু শস্যোৎসব। টুসুর নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই। জঙ্গলমহলে পৌষ পরবের সময় টুসুর যে মূর্তি দেখা যায় তা নিতান্তই অনেক অর্বাচীন। সাধারণত প্রদীপ সজ্জিত একটি মাটির সরা, স্থানীয় ভাষায় যাকে টুসু খোলা বলা হয়, সেই টুসু খোলাতে ধানের তুষ আর তুষলি রেখে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পৌষের প্রতি রাতে টুসু গান করে কুমারী মেয়েরা টুসুর আরাধনা করে।[৯] টুসুর আরাধনায় কুমারী মেয়েরা প্রধান ভূমিকা পালন করলেও টুসুগীতে আদিবাসী সমাজের সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। গ্রামীন সমাজের কৃষিউৎসবে কুমারী মেয়েদের অংশগ্রহণ প্রজননশক্তির ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখালেও আদিবাসী সমাজের ধর্মাচরণ ও ধর্মভাবনায় নারীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—এই ইঙ্গিতও অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই।

অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ধানের তুষ-তুষলির সঙ্গে লৌকিক দেবী টুসুর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আসলে প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ মানুষ যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করে বা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে সব সামগ্রী দেখে থাকে সেই সমস্ত বস্তুই তার কাছে অনেক সময় দেবতার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই লৌকিক দেব-দেবীগুলি আদিমতার পরিচায়ক। কেননা, আদিম কালের ঘর গৃহস্থালির নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র থেকে ও বন জঙ্গলের আদিম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছে লৌকিক জীবনের এই সমস্ত আদিম দেবদেবী। প্রতিদিনের কৃষিকর্ম, পশুচারণ, বনজঙ্গলে নদীনালায় শিকার

সন্ধান ইত্যাদি প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জীবন ধর্মের মধ্যেই আদিম মানুষ কল্পনা করেছে তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের। জীবনে দেবদেবীদের কাছ থেকে অধিকতর সাফল্য লাভের আশায় আরও বেশি আহার্য দ্রব্য, আর বেশি ফসল, আর বেশি শিকার ও সেই সঙ্গে নিজেদের বংশবৃদ্ধির আশায় কৃপাপ্রার্থনা করেছে তাদের আরাধ্য দেব-দেবীদের কাছে। জঙ্গলমহলের আদিবাসী মানুষজনও এইজন্যে তুষ-তুষলিকেও টুসু নামক শস্যের দেবী কল্পনা করিয়া তারই উৎসবে মাতোয়ারা হন।[১০]

কোন কোন গবেষক এরকম প্রশ্ন আবার তুলতেই পারেন যে, টুসু কি তাহলে সৃষ্টির প্রতীক? কুমারী মৃত্তিকা ফলবতী হবার প্রতীকতা বহন করে কি এই টুসু? আগামী বসন্তের মদনোৎসবের ইঙ্গিতও কি প্রকাশ পায় টুসু গানে? এইসমস্ত প্রশ্নের উত্তরে সুবোধ ঘোষের উদ্ধৃতি তুলে ধরে গবেষক নিত্যানন্দ রায় মনে করেন বৃক্ষপূজা, পাথরপূজা, মহামাতা কল্পনা, বলিদান প্রথা, দেবতুষ্টি বা দেবতার কোপশান্তি প্রথা, সাকার দেবতার কল্পনা, টোটেম পূজা, উর্বরতা পূজা, মৃত পূর্বপুরুষের পূজা, - প্রধানত এইগুলি হলো আর্যপূর্ব ভারতের প্রধান সংস্কার ও আচার। গবেষক নিত্যানন্দ রায় আবার প্রশ্ন তোলেন, প্রাচীন মানুষের এই ধর্মাচারের মধ্যে কি কোন দার্শনিক তত্ত্ব ছিল না? অবশ্যই ছিল। কারণ, এই ধর্মাচারের ও সংস্কারাদির বিশ্লেষণ করেই আমরা আদিম মনের একটি মূল জিজ্ঞাসার সূত্র পাই সৃষ্টির রহস্যে। এটা হল বস্তুত মানুষের মনের কাছে প্রথম রহস্য এবং প্রথম প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই আমরা এমন একটি দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত হতে পারি, নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু সারসত্তা আছে যা সব জন্মশীল জীবের মধ্যে থেকে সৃষ্টিকর্ম করিয়ে চলেছে। এই সারসত্তাটি হল আত্মা, যা সকল জীবনের সার। যারমধ্যে এই জীবনের সার নেই, সে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, সে মৃত। সমস্ত উর্বরতাই হল জীবনের আত্মা। আদিম মানুষের ধর্মসংস্কারের দার্শনিক তত্ত্ব বলে যদি কিছু থেকে থাকে, অনেক গবেষকই তার প্রধান ভিত্তি হিসাবে এই জীবনের সারসত্তা আত্মসত্তা ও উর্বরতা শক্তির মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। জঙ্গলমহলের টুসুও প্রধানত কুমারী মেয়েদের এই উর্বরতা শক্তির তত্ত্বের আরাধনা বলেই অনেক গবেষক ইঙ্গিত করেন।[১১]

এছাড়াও, আবার কোন কোন গবেষক মনে করেন, তুষ-তুষালির মধ্যে একজন পুরুষ দেবতা ও একজন নারী দেবতা আছেন। তুষ ধানের বড় খোসা পুরুষ দেবতা এবং তুষালি ধানের ভাঙা বা ক্ষুদ্র খোসা নারী দেবতা। যেহেতু তুষ-তুষালি নতুন সৃষ্টির প্রতীক সেইহেতু পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের ফলেই যে সৃষ্টি সম্ভব হয় এরকম দার্শনিক ভাবনারও ইঙ্গিত আছে বলে কোন কোন গবেষক অনুমান করেন।[১২]

অবশ্য টুসু উৎসব জঙ্গলমহলে কখন কিভাবে শুরু হয়েছিলো সে সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে নেই। গবেষক ডঃ বিনয় মাহাত মনে করেন, 'টুসু' শব্দটি ধানের খোসা তুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই তুষ মৃত ধানের প্রতীক। আর জলাশয়ে টুসু বিসর্জনের অর্থ হল মৃত শস্যকে কবর দেওয়া। মৃতকে কবর দেওয়ার অনুষ্ঠান হলেও টুসু উৎসব শোকোৎসব নয়, বরং মৃতের অবশ্যম্ভাবী পুনর্জন্মকে ত্বরান্বিত করার জন্য যাদুক্রিয়ার মাধ্যমে আনন্দোৎসব। গোবর, পুটলিগোলা প্রভৃতি উর্বরতাজ্ঞাপক ইন্দ্রজালিক উপকরণের মাধ্যমে ধরিত্রীর উর্বরতা শক্তিকে বৃদ্ধি করে মৃত শস্যের পুনর্জন্মকে ত্বরান্বিত করার কৌশলমাত্র।[১৩]

গবেষক বঙ্কিম মাহাতও মনে করেন, আদিম মানুষ প্রকৃতিতে বিচিত্র লীলার প্রকাশ দেখত। গাছপালা, লতাগুল্ম এক বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করে, আবার একসময় শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু কিছুকাল বাদে আবার নতুন চারা গজিয়ে ওঠে। এই দেখেই তারা জন্ম-মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে একসূত্রে গ্রথিত করে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এইজন্যই প্রকৃতিতে মৃত্যু দেখেই মোটেই তারা আশাহত হত না। তাই মৃত্যু সম্পর্কিত উৎসবেও তারা জীবনের গান গাইত। কারণ তারা জানত, বৃক্ষলতাগুল্ম, জীবজন্তু ও মানুষের মৃত্যু ঘটে এই কারণেই যে তারা আবার পুর্ণজীবন লাভ করবে। এবং জঙ্গলমহলের এই টুসু উৎসবও হল শস্যের মরণোৎসব।[১৪] তাই টুসু উৎসব শস্যের মরণোৎসব হলেও শত অভাব অনটনের মধ্যেও জীবনের জয়গান

গাওয়াই টুসু ধর্মভাবনার মূল মহাবাণী।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে শুধু এইটুকুই বলিব যে, টুসু হল জঙ্গলমহলের এক লৌকিক দেবী। এই দেবীর পূজার কোন মন্ত্র নেই। টুসু গানই হল এই দেবীর আরাধনার একমাত্র মন্ত্র। এবং সমগ্র জঙ্গল মহলে হাজার হাজার টুসু গান লোকমুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, নতুন নতুন অসংখ্য গীত নানা বিষয়ভাবনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে। এইসমস্ত গীতের বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র টুসু ধর্মচর্চার দার্শনিক দিকগুলি নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। টুসু উৎসব যে শস্যের মরণোৎসব-এ বিষয়ে অনেক গবেষকই মোটামুটি একমত। কিন্তু টুসু উৎসব শস্যের মরণোৎসব—এইটুকুই এই প্রবন্ধের টুসু উৎসবের দর্শনভাবনা নির্মাণের শেষকথা নয়। গাছপালা, জীবজন্তুর, এমনকি মানুষের মৃত্যু হলেও কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী তার পুনর্জন্ম হয়, অর্থাৎ আত্মা অমর। এবং এই আত্মা শুধু মানুষের দেহেই অবস্থান করে না, মানুষ ছাড়াও গাছপালা, পশুপাখি সবার মধ্যে বিরাজমান- এইরকম দার্শনিক তত্ত্বেরও এই টুসু উৎসব ইঙ্গিত করে। জঙ্গলমহলের আদিবাসী মানুষজনের টুসু দেবীর ধর্মচর্চার আরাধনা যেন বলতে চাইছে — প্রকৃতিতে গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সে যেই হোক না কেন, সে যখন জন্মেছে তখন তার মৃত্যু হবেই। কাজেই মৃত্যু যদি জীবনের চরম সত্য হয়, তাহলে সেই দেহের মৃত্যুর জন্যে শোক করা উচিত নয়; বরং শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকেও আনন্দের সহিত সাধ্যমত আপন আপন কর্তব্য দায়িত্ব পালন করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সাধনা হওয়া উচিত। অর্থাৎ তথাকথিত চার্বাক বাদে, প্রায় সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই যেমন মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ হিসেবে মোক্ষকে মেনে নেন এবং মোক্ষলাভের জন্যেই মানবজীবনে সাধনা করার কথা বলেন, জঙ্গলমহলের আদিবাসী মানুষেরা এরকম মোক্ষের ধারণাকে মানে না; বরং তারা মানবের কল্যাণের জন্যে, জগতের কল্যাণের জন্যে, মাতৃসমা প্রকৃতিকে উপাসনা করার জন্যে এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাময় জীবনেই বারে বারে ফিরে আসতে চায়।[১৫]

তথ্যসূত্র ও টীকা

অধ্যাপিকা ডঃ মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই প্রবন্ধ রচনার জন্য কৃতজ্ঞ। কারণ, অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায়ের আমার পি.এইচ.ডি.-এর গবেষণাপত্রের নির্দেশনার ফলেই এই প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করি।

১। ভবতোষ শতপথী, "পাত্যাল যাতরা", *অরণ্যের কাব্য ও সংকলিত ভবতোষ,* অর্পিতা পাবলিশার্স, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃ.১৪৭।

২। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর-১৯৬৬, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি - ২০০৮, মাঘ-১৪১৪, পৃ. ১৩৭।

৩। ডঃ দয়াময় মণ্ডল, *দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার টুসু-ভাদু ও ঝুমুর (সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়),* জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ৮-এ ও ৫-বি, কলেজ রো, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-২০১২, পৃ.৪২।

৪। শান্তি সিংহ, *টুসু,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৬৮, টুসু সংক্রান্তি-১৪০৫, পৃ. ৭০-৭১।

৫। তদেব, পৃ. ৭১-৭৪।

৬। জ্যোতি লাল মাহাত, *সিন্ধু থেকে সুবর্ণরেখা (কুড়মি জাতির ইতিহাস),* পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজ, দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজ এবং "টৈঁসফুল" কুড়মালি (সিন্দরী, চাষমোড়), পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ- ১৪২১, ইং মে-২০১৪, পৃ. ৯২-৯৩।

৭। জলধর কর্মকার, *পুরুলিয়ার লোকশিল্প ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ,* পুরুলিয়া জেলা-সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-৭০০০০১, বর্ষ-৪০, সংখ্যা-১১, জুন-২০০৭, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-১৪১৪, পৃ.১৯২।

৮। এটি একটি জঙ্গলমহলের অতি পরিচিত টুসু গীত। এই টুসু গীতের কোন ব্যাক্তি বিশেষ মেধাসত্ত্বের দাবিদার নয়।

৯। সোমা মুখোপাধ্যায়, *রাঢ়বঙ্গের লোকমাতৃকা,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৬৮, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ. ৪৬-৪৭

১০। নিত্যানন্দ রায়, *'টুসু ও টুসু গান', লোকায়ত মানভূম,* প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা, শক্তি সেনগুপ্ত ও শ্রমিক সেন, প্রকাশনা ও পরিবেশনা, অন্তরাল, বিজি-১১৮, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশঃ বইমেলা-১৪০৭, পৃ.১৬৬।

১১। তদেব, পৃ. ১৬৭।

১২। তদেব, পৃ. ১৬৮।

১৩। ডঃ বিনয় মাহাত, *লোকায়ত ঝাড়খণ্ড,* নবপত্র প্রকাশন, ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া-১৩৯১, সেপ্টেম্বর -১৯৮৪, পৃ. ২৪১।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, *ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য,* বাণীশিল্প, ১৪-এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ পৌষ সংক্রান্তি-১৩৮৪, জানুয়ারি -১৯৭৮, প্রথম বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ, পৌষ সংক্রান্তি-১৪০৬, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১০২-১০৩।

১৫। তাদের কথা মনে পড়ে, স্বর্গীয় বিপিন মাহাত ও স্বর্গীয় পুঁটিবালা মাহাত, আমার ঠাকুদ্দাদু ও ঠাকুমাই, জীবনের প্রথম টুসু গানের স্বাদ, যারা আমাকে দেয়। গ্রাম-ধরমপুর, ডাকঘর-দেবগ্রাম, থানা- গোয়ালতোড়, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১২৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ।